Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 406 - 416
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 406 - 416
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

শংকরের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ও সৃষ্টিসম্ভার

উজ্জ্বল মণ্ডল
Email ID: umondal0968@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
স্মৃতিকথা, জীবনাভিজ্ঞতা, অনালোচিত ঔপন্যাসিক-ব্যক্তিত্ব, ভ্রমণাভিজ্ঞতা, অমনিবাস।

Abstract
শংকর একজন বর্ষীয়ান লেখক। ১৯৫৫ সালে প্রথম বই 'কত অজানারে' প্রকাশের পর থেকে তিনি অনবরত লিখে চলেছেন। ইতিমধ্যে বিশ-শতক অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা আছি একুশ শতকের তিনের দশকে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও তিনি সমানভাবে সৃষ্টিশীল। সম্প্রতি (২০২৪, বইমেলা) তাঁর 'অচেনা চিন্ময় : গাঁয়ের যোগী সাগরপারে' বইটি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সমকালে বা বেশকিছু পরে লেখালিখির জগতে এসেছেন এমন অনেকেই সাহিত্যিক মহলে সসম্মানে স্বীকৃতি পেয়েছেন। অথচ শংকরকে কেউই তেমন ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। অন্তত ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি মর্যাদা পাননি কখনও। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ), অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (কালের প্রতিমা, দে'জ), হীরেন চট্টোপাধ্যায় (সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য, দে'জ) এই তিনজনের লেখায় বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত আকারে শংকরকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে। ২০১৮ সালে গবেষক তীর্থ দাস 'নির্বাচিত চলচ্চিত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শংকরের সাহিত্য : একটি সমীক্ষা'-এই শিরোনামে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'জন-অরণ্য' (১৯৭৬) ও 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১) সিনেমার চিত্রনাট্যই সেখানে গবেষকের প্রাথমিক উৎস এবং প্রতিপাদ্য শংকরের উপন্যাসের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যের তুলনামূলক আলোচনা। 'বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ' থেকে প্রকাশিত ইন্দ্রাণী রুজের 'জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাস ও শংকরের চৌরঙ্গী (১৯৩০-২০০০)' বইতে কেবলমাত্র জনপ্রিয়তার নিরিখে 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। শংকরের উপন্যাসগুলোর সামগ্রিক আলোচনা কোথাও নেই। আজ অবধি তাঁর একটিও উপন্যাসের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। অথচ তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। শংকরকে নিয়ে বা শংকরের লেখাপত্র নিয়ে আগে কোনো গবেষণাধর্মী কাজ হয়নি। আমাদের প্রথাগত অ্যাকাডেমিক চত্বরেও শংকর বিশেষ আলোচিত নয়। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসের সঠিক প্রকাশকাল পাওয়া যায়না। খুব বিখ্যাত ও প্রথম দিকের উপন্যাসগুলো ছাড়া কোথাও নির্দিষ্ট প্রকাশকাল নেই, সঠিক কোনো গ্রন্থপঞ্জিও নেই। যেগুলো আছে সেগুলোর তথ্যবিভ্রান্তি খুব সহজেই চোখে পড়ে। সেখানে প্রকাশকের গাফিলতিও রয়েছে যথেষ্ট। বেস্টসেলার লেখক বলেই তিনি ব্রাত্য থেকে গেলেন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 406 - 416
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিনা জানিনা! তবে তাঁকে নিয়ে আজও খুব একটা চর্চা হয়নি, হচ্ছে না। তিনি প্রচুর উপন্যাস লিখেছেন। অনেকের মধ্যে তিনিও কিছু উপন্যাসের জন্য বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে আলোচিত হওয়ার যোগ্য দাবীদার। প্রথমে আমরা তাঁর জীবনকে দেখার চেষ্টা করবো। কেননা উপন্যাসগুলি তাঁর জীবনাভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। নিজের পেশাগত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁর লেখাতেও আমরা পাই। তিনি আত্মজীবনী লেখেননি। তবে বেশকিছু স্মৃতিকথা তিনি লিখেছেন। সেখান থেকেই তাঁর জীবনের ধারাবাহিক আমরা উদ্ধার করবার চেষ্টা করতে পারি।

Discussion

স্মৃতিকথামূলক কয়েকটি গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আত্মজীবনীর অনেক উপাদান সন্নিবেশিত করেছেন শংকর। সেগুলো একত্রিত করে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রণালীবদ্ধ করলেই তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন প্রকাশ পেতে পারে। ১৯৩৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর বনগ্রামের ছায়াস্নিগ্ধ একটি পল্লীতে মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। এই বনগ্রামকে আমরা বনগাঁ বলেও জানি। তখনও দেশভাগ হয়নি। তৎকালীন ভারতের যশোহর বা যশোর জেলার অধীনস্ত ছিল বনগ্রাম। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পাঞ্জাব ও অখণ্ড বঙ্গদেশের সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে র‍্যাডক্লিফ সাহেব (১৮৯৯-১৯৭৭) এমন গণ্ডগোল পাকালেন যা ইতিহাসে 'র‍্যাডক্লিফ লাইন' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। অশীতিপর শংকর মজা করে বলেছেন,

> "তারপর কিশোর চোখে একদিন অবাক হয়ে দেখলাম বড়রা আমার দেশটাকেই দু-টুকরো করে দিল। কয়েক ঘন্টার জন্য আমার জন্ম ভিটেটাও পাকিস্তান হয়ে গেছিল। ফ্ল্যাগ উঠে গেছিল সেই দেশের। তারপর কারা যেন র‍্যাডক্লিফ সাহেবের ম্যাপে সিরিয়াস ভুল বার করাতে আমরা আবার পাকিস্তানি থেকে ভারতীয় হয়ে উঠলাম।"[১]

দেশভাগের পর বনগ্রাম আর যশোর জেলার অন্তর্গত রইল না। বনগ্রামের নতুন জেলা হল চব্বিশ-পরগণা। যা বর্তমানে উত্তর-চব্বিশ-পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত। বনগ্রামের যে ভাড়াবাড়িতে লেখকের জন্ম তার নাম ছিল ননীবাবুর বাড়ি। শংকরের জন্মের পরপরই তাঁর বাবা হরিপদ মুখোপাধ্যায় বনগ্রামে কিছু জমি কেনেন। সেই গল্পটা আমরা কিছু পরে শুনবো। এখন পূর্বপুরুষদের কথা কিছু উল্লেখ করবার প্রয়োজন। মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের মাতামহ ক্ষীরোদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নকফুল গ্রামের (গ্রামটি বনগ্রামের পাশেই অবস্থিত) বাসিন্দা। তিনি কলকাতার এক ইংরেজ কোম্পানিতে মাঝারি গোছের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। দাদুর চেহারার বর্ণনা তিনি সম্ভবত মা বা দিদিমার কাছে শুনে থাকবেন। যেমনটা তিনি লিখেছেন দাদু সম্পর্কে,

> "দীর্ঘদেহী, উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ, শরীরের কোথাও মেদাধিক্য নেই, মুখে সবসময় হাসিটি লেগে আছে; যদিও কিছুটা দুঃসাহসী এবং বেপরোয়া।"[২]

একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি। সম্ভবত ফেয়ারলি প্লেসের কোনো অফিসের এক ইংরেজ ছোকরা তার জুতোটা তুলে দিয়েছিলেন ক্ষীরোদবাবুর চেয়ারের উপর। তিনি অপমানিত হয়ে প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন একটি থাপ্পড়। তারপর নিজেই অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেদিনের পর থেকে আর ওদিকে যাননি। তাতে আত্মাভিমান ও স্বদেশীয়ানার জয় হলেও জীবিকাহীন দাদুর সংসারে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হল। অগত্যা তিনি সুন্দরী বিবাহযোগ্যা তিন কন্যা ও দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সস্ত্রীক গ্রামে ফিরে আসেন। কিন্তু উপার্জনের জন্য বেশিরভাগ সময় কলকাতায় থাকতেন। এই সময়ের দাদুকে শংকর তুলনা করেছেন 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের হরিহরের সঙ্গে। আর দিদিমা সর্বজয়াসদৃশ অমৃতবালা দেবী ছিলেন পরমাসুন্দরী। থাকতেন উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে। ১৯৩৯ সাল নাগাদ স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হলে দিদিমার কাছে যান শংকর। বয়স তখন ন'বছর, দাদু পরলোকগত। দিদিমার সঙ্গে কাশীমিত্তির ঘাটে স্নান করতে গিয়ে জানতে পারলেন ঘাটের পাশের শ্মশানেই কয়েকবছর আগে দাদুকে দাহ করা হয়েছিল। মনখারাপ করে ফিরে এলেন। 'চরণ ছুঁয়ে যাই' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে দিদিমার সম্পর্কে যখন লিখছেন তখন স্মৃতি অনেকটা অস্পষ্ট। সেই ধূসর স্মৃতি উদ্ধার করে লিখছেন,

> "দিদিমার সিঁদূর পরা সধবা রূপটা স্মরণে আনতে পারি না, আমি তাঁকে দেখতে পাই সাদা থান পরা যোগিনী রূপে। মাথার চুল ছাঁটা, দুধে আলতা রঙ, মুখটি যেন ঈশ্বরের এক অনবদ্য শিল্পকর্ম।"[৩]

ক্ষীরোদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহের সময় তাদের অবস্থা নেহাত মন্দ ছিল না। অমৃতবালাও জন্মেছিলেন আদরের দুলালী হয়ে। বাবা ছিলেন সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁর ছিল গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা ধান, সিন্দুকভরা সোনারূপো। বিয়েতেও সর্বসাকুল্যে একশ-ভরি সোনার গয়না নিয়ে স্বামীর ঘরে এসেছিলেন। কিন্তু সবশেষ হয়ে গেল দাদুর বদমেজাজী স্বভাবের কারণে। 'স্বামীর ভাগ্যেই মেয়েদের ভাগ্য' দিদিমার মুখে শোনা এই প্রবচনটি হয়তো সত্যি হয়েছিল! ক্ষীরোদ বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি খোয়ানোতে অমৃতবালা পাঁচ সন্তানকে নিয়ে নাজেহাল হলেন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসিমুখে সব সহ্য করেছেন। অসম্ভব কষ্টের মধ্যেই সকলকে প্রতিপালন করেছেন।

নিজের আত্মপরিচয়ের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে মায়ের কথাই লিখেছেন শংকর। বাবা হরিপদ মুখোপাধ্যায় প্রথম পক্ষের স্ত্রী নিভাদেবীর অকাল মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করবেন বলে মনস্থির করেন। অন্যদিকে ক্ষীরোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মেজাজ হারিয়ে সওদাগরি অফিসের চাকরি হারানোর ফলে প্রবল অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন সেকথা আগেই বলেছি। তিনি এই আর্থিক সমস্যার মধ্যেই দ্বিতীয়া কন্যা গৌরীকে পাত্রস্থ করতে উদ্যোগী হন এবং হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে দেন। এ ব্যাপারে শংকরের বক্তব্য,

> "... অর্থাভাবে এবং সামাজিক সমালোচনার আশঙ্কায় আমার মায়ের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রকে নির্বাচন করা হয়েছিল।"[৪]

বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌরীদেবী দু'টি জিনিস হারালেন। এক, যুবক স্বামী পাওয়ার বাসনা; এবং দুই, পিতৃদত্ত নিজের সাধের নাম 'গৌরী'। নাম বদলানোর কারণটা বড়ই অদ্ভুত। বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম ছিল গৌরীশঙ্কর। এক পরিবারে মা-ছেলের একই নাম হওয়া চলবে না, সংসারে অমঙ্গল হবে। অগত্যা নাম হল 'অভয়া'-'অভয়ারানী'। শংকরের জন্মের সময় ক্ষীরোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েকে দেখতে আসেন। অভয়ারানী তখন অঝোরে কাঁদছেন। কারণ, অমন সোনা রঙের মাতৃগর্ভে কালো রঙের ছেলে! দাদু নবজাতকের রঙ ফর্সা করবার জন্য উপহার হিসেবে জার্মান পিংক পাউডার এনেছিলেন। মেয়েকে আশ্বস্ত করেছিলেন, ছেলে একদিন কেউকেটা কিছু একটা হবে! এমনকি দিদিমা অমৃতবালাও রঙ কালো হলে বুদ্ধি বেশি হয় এমন কথা বলে কন্যার মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করলেন। পরবর্তীতে স্বামীহারা অভয়ারানী নিদারুণ অর্থকষ্ট সহ্য করে সন্তান প্রতিপালন করেছেন। সমস্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাংলা উপন্যাস পড়তেন। শরৎচন্দ্র পড়তে খুব ভালোবাসতেন তিনি। কখনো স্কুলে যাননি, নিজের চেষ্টায় বাংলাটা আয়ত্ত করেছিলেন। বিশ্বসংসার সম্পর্কে তাঁর সমস্ত জ্ঞান এসেছিল বাংলা বই থেকে। মায়ের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

> "আমার মা'কে কোনোদিন কাউকে হিংসে করতে দেখিনি। তাঁর দুর্বলতার মধ্যে বীণাপাণি লাইব্রেরির নভেল পড়া, অমাবস্যার দিনে জবাফুল নিয়ে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে যাওয়া।"[৫]

বাবা হরিপদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বনগ্রামের মহাকুমা আদালতের উকিল। বনগ্রামে জমি কেনার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু বেশকয়েক বছর পর যেখানে ভাড়া থাকতেন, সেই বাড়িওয়ালার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে গেল। তখন বনগ্রামে সন্ধ্যার পর লিচুতলায় সাহিত্য, শিল্প, নাটক ইত্যাদি নিয়ে রসিকদের সান্ধ্য-আড্ডা বসত। উপস্থিত থাকতেন মফস্বলের মাথারা। যার উল্লেখ আছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেও। সেদিন আড্ডার বিষয় ছিল ভাড়াটে বাড়ি ও নিজের বাড়ি। সকলেই একমত হলেন, 'হরিপদ উকিলের ভাড়া বাড়িতে থাকা মানায় না'। ব্যস, হঠকারী ভাবে সেদিন রাতের অন্ধকারে তারা সবাই মিলে পেয়াদাপাড়ায় হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের নতুন গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ছাড়লেন। হরিপদ বাবুও বন্ধুদের খুব ভালোবাসতেন।

> "...বাবা বেশি কথা বলতেন না ছেলের সঙ্গে, কিন্তু মুখর হয়ে উঠতেন বন্ধুদের সান্নিধ্যে।"[৬]

এই বাড়ি তৈরি করতে গিয়েই গ্রামছাড়া হয়েছিল লেখক পরিবার। ১৯৩৭ সালে হাওড়ায় চলে আসতে হল সপরিবারে। কারণ ছিল অনেক, বাড়ির খরচ বাবদ অনেক দেনা জমে গিয়েছিল। মফঃস্বলের উকিলের হাতে এত টাকা ছিলনা যে দেনা শোধ করবেন। আবার দুর্ভাগ্যবশত সেই সময় আদালতের এক্তিয়ার পরিবর্তিত হওয়ায় বনগ্রাম কোর্টে কাজের পরিমাণ একেবারে কমে গেল। স্বাভাবিকভাবে উপার্জনও কমে গেল। এই সময় হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক প্রাক্তন মুনসেফের

(তিনি এক সময় বনগ্রাম কোর্টের বিচারক ছিলেন) সাক্ষাৎ হল শিয়ালদা স্টেশনে। তাঁর পরামর্শেই হাওড়া চলে আসেন। শংকরের লেখা থেকে জানতে পারা যাচ্ছে,

> "ভাগ্যের বিচিত্র খেয়ালে পাঁচ বছর বয়সে এমন সাধের স্বর্গরাজ্য ছেড়ে আমি হাওড়া মুখো হলাম, ভায়া শিয়ালদহ স্টেশন। তখন শিয়ালদহ স্টেশনে যারাই নামত তাদেরই বাঙাল বলা হত।"[৭]

ঠিক এই জন্যই তাঁকে বহুকাল 'বনগ্রামের বাঙাল' অপবাদ শুনতে হয়েছে স্কুলের বন্ধু-বান্ধবদের থেকে। হাওড়ায় এসে চৌধুরী বাগান লেনের এক ছোট্টোগলিতে একখানা বাড়িভাড়া নিয়ে সপরিবারে থাকতে শুরু করলেন হরিপদ মুখোপাধ্যায়। চৌধুরী বাগান নাম হলেও এই বিশাল জনবসতির অধীশ্বর ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিহারীলাল চক্রবর্তী। আগের নামটা পাল্টে গেল। 'চৌধুরীবাগান লেন' হয়ে গেল 'বিহারী-চক্রবর্তী লেন'। বাড়ির নম্বর ছিল ১৮/এল। 'বাবাকে মনে পড়ে' শীর্ষক রচনায় শংকর লিখেছেন,

> "আমার বাবা, ভীষণ রাশভারি লোক ছিলেন। সারাক্ষণ জীবিকার তাগিদে ব্যস্ত থাকতেন। মস্ত বড় সংসার, কোনো সঞ্চয় নেই, বাড়তি দায়দায়িত্ব আছে। হাতের গোড়ায় প্রলোভন অনেক, অপরের টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি সাময়িকভাবে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে। তবু বাবা প্রাণপণ চেষ্টা করতেন নিজেকে কলুষিত না করতে।"[৮]

হরিপদ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, একই সঙ্গে আইনের ডিগ্রিও লাভ করেছিলেন। সাহিত্যের দিকেও ঝোঁক ছিল যথেষ্ট। বিশেষত নাটকের পেছনে যৌবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করেন। এক সময়ে কিছু সাহিত্যসৃষ্টির কাজও করেছিলেন। বড় কৃতিত্বের মধ্যে ছিল তাঁর রচিত নাটক 'দুর্গাবতী'। যা একদা কোহিনূর থিয়েটারে বিরাট সাফল্য অর্জন করে। ১৮/এল -এর ঠিক সামনের বাড়ি ১৮/কে; এখানেই প্রথম আলাপ হয় বাদলচন্দ্র বসুর সঙ্গে। এই বাদলকাকুর স্নেহের পাত্র ছিলেন ছোট্ট শংকর। বাদল বসুর কাছে তিনি ছিলেন 'শঙ্কুসায়েব'। স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়,

> "...বাদলকাকুই প্রথম মানুষ যিনি আমাকে কখনও ছোট বলে মনে করতেন না; সর্ব অর্থে আমি ছিলাম তাঁর সমবয়সি বন্ধু।"[৯]

বাদল বসু স্বদেশী করতেন, আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন। দোষের মধ্যে ছিল, নিজের অচরিতার্থ বাসনাগুলি নিজের ছোটভাইয়ের মাধ্যমে পূর্ণ করা। ছোট ভাইকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার বাসনায় নিজে আজীবন অকৃতদার রইলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হয় তাকে। ছোট ভাই বাড়ি থেকেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেই ছোট ভাইয়ের নাম বিজয়চন্দ্র বসু। শংকরের পচু কাকু। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পচু কাকুর হাত ধরেই হাওড়া জেলা স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলেন শংকর।

এই সময়ের কিছু ঘটনা এখানে বলে নেওয়াই ভালো। হাওড়া জেলা স্কুলে পড়ার সময় একজন মাস্টারমশাই ছিলেন সতীশচন্দ্র তফাদার (অনেক জায়গায় তরফদার লিখেছেন)। তিনি নীচু ক্লাসে অঙ্ক ও হাতের কাজ শেখাতেন। লজ্জার বিষয়, এই দুটো ব্যাপারেই শঙ্কর অত্যন্ত কাঁচা ছিলেন সুতরাং মাস্টারমশায়ের প্রতি ভীতি তৈরী হল। দূর থেকে তাঁকে দেখলেই পালিয়ে যেতেন। ইনিই তাঁর ইস্কুলের প্রথম মাস্টারমশাই। যদিও এই সতীশচন্দ্র তফাদারই তাকে হাওড়া জেলাস্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। তবে প্রধান ভূমিকা ছিল পচুকাকু অর্থাৎ শ্রীবিজয়চন্দ্র বসুর। ইনি বাদলচন্দ্র বসুর ছোট ভাই। কিন্তু যাঁকে জীবনের প্রথম মাস্টারমশাই বলেছিলেন, তিনি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মান্না। বাবা হরিপদবাবুর মুহুরি ছিলেন এই যোগেন মান্না। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কাহিনি উত্থাপন করেছেন শংকর। সেখান থেকে কিছু উদ্ধার করলাম,

> "এরকম অসাধারণ মাস্টার আমি জীবনে আর দেখিনি। ধৈর্যের এবং স্নেহের প্রতিমূর্তি। ...মাস্টারমশায়ের কাছে আমার আসল শিক্ষা শুরু হত রাত্রে, খাওয়া-দাওয়ার পরে যখন আমরা দু'জন পাশাপাশি শুতাম। দিনের শেষে ক্লান্ত শরীরে তিনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হতে চাইতেন, আর আমি একঘুম সেরে তাঁর কাছে গল্প শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। ... গল্পের জগতের সঙ্গে আমার পরিচয় এই মাস্টারমশায়ের মাধ্যমে। তাঁর কাছে গুল্প বলার ধরনটা শিখেছি, ..."[১০]

আরেকজন মাস্টারমশাইয়ের কথাও এখানে বলে নেওয়া ভালো। শংকরের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। এম. এ. পাশ করবার পর তিনিও শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। মাস্টারমশাই হিসাবে বউবাজার অঞ্চলে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনিও অত্যন্ত সাহিত্যপ্রেমী ও রসিক মানুষ ছিলেন। ছাত্রদের খুব

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 406 - 416
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভালোবাসতেন। মাস্টারমশাই হিসেবেই জনপ্রিয় ছিলেন ছাত্রমহলে। ইস্কুলে যখন বাংলা পড়াতেন তখন নিতান্ত নীরস বিষয়ের মধ্যেও সাহিত্যরসের প্রবেশ ঘটাতেন। বাংলা সাহিত্য ছাড়াও যে ইস্কুলে ছেলেদের আরও অনেককিছু পড়বার রয়েছে তা তিনি ভুলেই যেতেন। একসময় বনগ্রামের সবচেয়ে কীর্তিমান কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯৪০ সালের প্রথম থেকেই শংকর হাওড়া জেলা স্কুলের নিয়মিত ছাত্র। কিন্তু সেখানে বেশিদিন পড়ার সুযোগ হল না। ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। সেই সূত্রধরে ইংরেজের শত্রু জাপানিদের দ্বারা ব্রিটিশদের উপনিবেশ ভারতবর্ষ আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিল। ইতিহাসে 'ইভাকুয়েশন' (Evacuation) এর ভীতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ কলকাতা ছেড়ে দলবেঁধে অপসারণের পালা। অগত্যা তাদেরকে বনগ্রামে ফিরে যেতে হল হাওড়া ছেড়ে। হরিপদ মুখোপাধ্যায় উপার্জনের জন্য আগেই কলকাতা ফিরে আসেন। বাকিরা কিছুদিনের জন্য বনগ্রামেই থেকে গেল। অভয়ারানী তখন সন্তানসম্ভবা। শংকরের ভাইয়ের জন্ম হয় সেবার। ধাত্রীমাতা হয়ে এসেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পিতৃবন্ধু পাঁচু স্যাকরার মা। শংকরের বয়স তখন সবেমাত্র ন'বছর। এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লিখেছিলেন,

> "আমি চাই না, পৃথিবীর কোনো বালক অথবা বালিকা এই বয়সে এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে কোনো সরকারি ডাক্তারখানা থেকে তার মায়ের জন্য ওষুধ নিয়ে আসুক।"[১১]

তবে ইভাকুয়েশনের ধাক্কা পুরোপুরি সামলানোর আগেই বাবার কথামতো শংকরও ফিরে এলেন বিহারী চক্রবর্তী লেনে। কারণ বাবা-মা কেউ চাননি ছেলের একটা বছর পড়াশুনা নষ্ট হোক। তাহলে বাবা মারা যাওয়ার পর মেট্রিক পাশ করাও হয়তো অধরা থেকে যেত। কঠিন কর্তব্যের বোঝা তার ঘাড়ে চাপার আগেই হয়তো তা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন বাবা-মা দু'জনে। কিন্তু ফিরে এসেও আহামরি কিছু হল না। কোথায় স্কুল! ইস্কুলবাড়ি তখন মিলিটারিদের অফিস। স্কুল বন্ধ হয়ে গেল সাময়িকভাবে। এই ধরণের ক্ষয়িষ্ণু ইস্কুলের মর্মস্পর্শী বর্ণনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনুবর্তন' উপন্যাসে রয়েছে। খবর ছড়াল হাওড়া জেলা স্কুল Re-open হওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চিত। তাই ১৯৪২ সালের শুরুতে বয়স যখন আট পেরিয়েছে, তখন বাধ্য হয়েই ভর্তি হতে হল খুরুট রোডের বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে। এই খুরুট রোডই পরে নেতাজি সুভাষ রোডে নামান্তরিত হয়েছে। হেডমাস্টারমশাই ছিলেন সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য। সবার প্রিয় হাঁদ্দা। তাঁর ছোটভাই অকৃতদার হিমাংশুশেখরও একজন অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন। সবাই গুঁইরামদা বলে ডাকত। তবে সুধাংশুশেখরের তুলনা ছিল না। যা পড়াতেন তা আর বই খুলে দেখার প্রয়োজন হত না। সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও বিনম্রভাব তাঁর শতশত ছাত্রের স্বভাবগত করেই ছেড়েছিলেন। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই অসাধারণ দক্ষতা ছিল। স্কুলের সাপ্তাহিক সাহিত্যসভায় নানা বিষয়ে লেখা দেওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন। জোর করে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়ে দিতেন। শংকর তাঁকে উদ্দেশ্য করে জানাচ্ছেন,

> "অজান্তে আমার সাহিত্যজীবন শুরু হল শিক্ষাগুরুর আশীর্বাদে। আমি যে তাঁর হাতের পুতুলের মতন।"[১২]

সুধাংশু বাবুর উৎসাহের প্রথম ধাক্কায় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন গান্ধীবাদ ও চরকা বিষয়ে। স্কুলের অন্য একজন শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর একটি পরিষদে শংকর চরকা কাটতে যেতেন। তিনিও লেখাটির প্রশংসা করলেন। সেদিন থেকেই প্রথম লেখক হওয়ার বাসনা জাগলো মনের অন্দরে। লেখালিখি বিষয়ে সুধাংশুবাবুর মত ছিল, সহজ হওয়াটাই সবচেয়ে কঠিন। মানুষ যেমন সহজ হলে সবার প্রিয় হয়; সহজভাবে লিখলে তেমন মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। 'নিরেট পাথরকেও সরস পান্তুয়ায় পরিবর্তিত করার দুর্লভ গুণ ছিল তাঁর'। নিজের লেখার মধ্যেও সুধাংশু বাবু এই স্টাইল অনুসরণ করতেন। জোর দিতেন পরিমিতিবোধের উপর। এই 'সুধাংশু-ঘরানা'ই শংকরের সাহিত্যপথের প্রথম ও প্রধান পাথেয়। শংকর লিখেছেন,

> "বাংলার এই স্টাইল যে মহামূল্যবান তা তখন বুঝিনি। কিন্তু যা খুঁজে পাবার জন্যে অনেক লেখককে দীর্ঘদিনের অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা চালাতে হয়েছে তা সুধাংশুশেখর নিজের হাতে আমাদের উপহার দিয়ে গিয়েছেন নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে।"[১৩]

১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের শরীর খারাপ শুরু হল। ব্লাড সুগার ধরা পড়ল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় অসুখ বেড়ে গেল। তারপর ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে এক গভীর রাতে তিনি চলে গেলেন মরণসাগর তীরে। তখন চারদিকে কারফিউ চলছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পাঁচ মাস বাকি। শংকরের বয়স তখন পনেরো পেরিয়েছে। ক্লাস টেনের ছাত্র।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 406 - 416
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হরিপদ বাবুর বাবা যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বছর। সেদিক থেকে শংকর অনেক ভাগ্যবান বলতে হবে। আটটি নাবালক সন্তান নিয়ে অভয়ারানী তখন অথৈ জলে। এই সময় থেকে 'কত অজানারে' প্রকাশের সময় (১৯৫৫) পর্যন্ত চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে শংকরের ব্যক্তিজীবন। মা একদিন ডেকে বলেন,

> "দু'তিন মাসের মধ্যে কিছু রোজগার করতে না পারলে অনশন ছাড়া আমাদের অন্য কোনো পথ নেই।"[১৪]

পিতার মৃত্যুর পর শংকর খুব ভেঙে পড়েছিলেন। স্কুলের হেডমাস্টার সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য তা দূর থেকে দেখতেন। স্কুলের মাইনে আবেদন করবার আগেই মকুব করে দিয়েছিলেন। ছোট ভাই হিমাংশুশেখর কোচিং ক্লাস করাতেন। সেখানে আসতে বলেন শংকরকে। এভাবেই তখন পড়াশুনার পর্বটা মিটেছে। এন. ডি. রাজপাল নামে এক পাঞ্জাবির কাছেও কিছুদিন কাজ করেছেন। জীবনের এই সময়কে তিনি বলেছেন 'সংগ্রাম পর্ব'। সেটি কেমন?

> "কলেজে যাই, স্কুলের ছেলে পড়াই, এবং সময় পেলে সামান্য ফেরিওয়ালাগিরি করি। তখন যে সাবানটা রাস্তায় বেচতাম তা বিখ্যাত 'সানলাইট' - এর নকল, নাম 'সনলাইট'। এই সাবান আমি নিয়ে যেতাম বিভিন্ন পান-বিড়ির দোকানে এবং ডজনে এক আনা রোজগারের দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করলাম। এই কাজের মাধ্যমে কলকাতার ওড়িয়া দোকানদারদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। এঁদের কাছ থেকে জীবনসংগ্রামে যে সাহায্য পেয়েছি তা ভুলবার নয়। ...জীবনের এই পর্বে সাহিত্যের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ স্থাপিত হল। প্রধান মাধ্যম অবশ্যই দেশ পত্রিকা।"[১৫]

সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য প্রতিদিন বিকেলে ভ্রমণে যেতেন। পাঁচ মাইল রোজ পায়ে হেঁটে যেতেন। এই ভ্রমণের সঙ্গী হতেন স্নেহের ছাত্র শংকর। যাত্রাসঙ্গী হয়ে যে বিরল জ্ঞানের প্রাচুর্য তিনি আত্মস্থ করেছিলেন তা পরবর্তী অনেক লেখনীর সহায়ক হয়েছে। অন্যদিকে বাবার জুনিয়র গিরীন্দ্রনাথ বসুও এই সময় পাশে ছিলেন। তাঁর বাড়িতে একটা টাইপরাইটার ছিল। শংকর আগে থেকেই সেখানে তালিম নিয়েছিলেন। ষোলো বছরে আই. এ. পাশ করেন রিপন কলেজ থেকে। কলেজের বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। সময়টা নির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও এরপরই তিনি বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন বঙ্গবাসী ইভিনিং কলেজ থেকে। এই সময়কে 'কর্মসংস্থান পর্ব' বলেছেন লেখক। শত কষ্টের মধ্যেও এসপ্ল্যানেড ম্যানসনের দোতলায় USIS (United States Information Services) লাইব্রেরিতে যেতেন রোজ। খাতায় নাম, ঠিকানা ও পরিচয় লিখতে হত। 'বেকার-চাকরিসন্ধানী' পরিচয় লিখতে সঙ্কোচ বোধ করে লিখতেন 'লেখক'। মনে মনে ভাবতেন মিথ্যে তো নয়। দু'তিনখানা লেখা ইতিমধ্যে স্কুল কলেজের ম্যাগাজিনে বেরিয়ে গেছে। তবে USIS লাইব্রেরির বিশেষ ভূমিকা ছিল শংকরের লেখক জীবনে। সেখানে বসেই একটি প্রবন্ধ লিখে শুভানুধ্যায়ী ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে পাঠালেন মাসিক বসুমতি পত্রিকায়। ঠিক পরের রবিবার তা প্রকাশিত হল। এভাবেই পরপর কয়েকটা লেখা বেরিয়ে গেল। কিন্তু আর্থিক অবস্থার কারণে সময় দিতে পারছিলেন না লেখালিখির পেছনে। তারপর লাইব্রেরিতে বসেই আরেকটি প্রবন্ধ লিখে পাঠালেন আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে। সেই প্রথমবার তিনি ডাকে দশটাকা পেয়েছিলেন। লেখক হিসেবে এটাই প্রথম উপার্জন। পাশাপাশি শর্টহ্যাণ্ডের কাজ শিখিতেন মন দিয়ে। সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য ডেকে নিলেন বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করার জন্য। একসময় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সেখানেই প্রথম শিক্ষকতা করবার সুযোগ পেলেন। সুধাংশু বাবু চাইতেন তাঁর ছাত্রটির পড়াশুনাতে যেন বিঘ্ন না ঘটে। দুপুরে স্কুলে চাকরি করে নাইট-কলেজ করা যেত। কিন্তু জীবন ও জীবিকার টানে শংকর তা পারলেন না। কলেজের পড়াশুনা আর হয়ে উঠলো না। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত প্রায় আটটি প্রাইভেট টিউশানি করাতেন। ছাত্রপিছু আয় ছিল বারো-পনেরো টাকা। শর্টহ্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য ইস্কুলের চিঠিপত্র টাইপ করতেন। শিক্ষকতা করার পাশাপাশি বিড়লার এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'জুট অ্যান্ড গানি' তে চাকরি নিয়েছিলেন। সেখান থেকেও তিরাশি টাকা মাইনে পেতেন। ইতিমধ্যেই স্কুলের সহপাঠী অনিলের মাধ্যমে তার দাদা বিভূতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন শংকর। শর্টহ্যাণ্ডের বেশিরভাগই এই বিভূতিদার থেকে শেখা। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

> "এমন জবরদস্ত স্টেনোগ্রাফার আমি জীবনে কম দেখেছি। সমস্ত কাজে তাঁর ছিল অসাধারণ নিষ্ঠা ও সেই সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা। মন পরিষ্কার না হলে আচরণ বোধহয় এমন পরিচ্ছন্ন হয় না।"[১৬]

বিভূতিদার চোখ দিয়েই তিনি প্রথম আইনপাড়াকে চিনেছেন। বারওয়েল সাহেবের কাছে চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র যাবেন। কারণ সাহেবের বয়স বাড়ছে, বিভূতিদাও সংসারী হয়ে পড়েছেন। হাইকোর্টের কেরানি-পাড়ায় আর সময় দিতে পারছেন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 406 - 416
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

না। তাই সেখানেই শংকরকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে চান তিনি। সময়টা ১৯৫০ সাল। বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের পাকা চাকরিটা ছেড়ে বিভূতিদার কথামতো শংকর চলে এলেন বারওয়েল সাহেবের কাছে টেম্পল চেম্বার্সে। সাহেব তখন সত্তর বছরের বৃদ্ধ। এখানে শংকরের কাজ কেরানিগিরি। প্রথমাবস্থায় মন সায় না দিলেও তিনি বুঝেছিলেন যে বারওয়েল সাহেবের সান্নিধ্যে থাকলে মানুষ হিসেবে অনেক সমৃদ্ধ হওয়ার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এখানে মাইনেও কিছুটা বেশি। স্কুলে পেতেন সাড়ে-বাষট্টি টাকা, সাহেব দেবেন আশি টাকা। খাটনি একটু বেশি হলেও অভিজ্ঞতা লাভের অগাধ সুযোগ।

> "সে এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। হাওড়া চৌধুরী-বাগানের কানাগলি থেকে বেরিয়ে আমি অজানা অচেনা এক আশ্চর্য বিশ্বের মুখোমুখি হলাম। আমি শুধু নতুন নতুন মানুষকে আবিষ্কার করলাম তাই না, নিজেকেও আবিষ্কার করলাম।"[১৭]

ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে সাহেব প্রথমবারের জন্য হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। শংকরের তা জানা ছিলনা। ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজে একটা মামলার কাজে গেলেন বারওয়েল। সেখানে দ্বিতীয়বার হার্ট-অ্যাটাক হল। অবিলম্বে তাঁকে লেডি উইলিংডন নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। সেদিন রাতেই তিনি মারা গেলেন। যেন দ্বিতীয়বারের জন্য পিতৃহারা হলেন শংকর। সে যুগে কলকাতার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহেবরা বাঙালিদের সঙ্গে যে-ধরনের ব্যবহার করতেন তা শংকরের কাছে অসহ্য ছিল। এমন সময়ে দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি ও একঘেয়েমিতা কাটাতে এক সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সেখানেই দেখা পেলেন গৌরকিশোর ঘোষের। ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে তাঁর সূত্র ধরেই সাগরময় ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ হল শংকরের। ১৯৫৪ সালে যখন 'দেশ' পত্রিকায় 'কত অজানারে' লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত তখনও বইটার কোনো নির্দিষ্ট নাম ছিল না। শুধু হাইকোর্টের চূড়ার একটা ছবি থাকত, আর প্রতি সপ্তাহে নাম পরিবর্তন হত। এই ধারাবাহিকের জন্য লেখক দেশ পত্রিকার তরফ থেকে দু'শো পঁচাশি টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। জীবনের এই পর্বে শংকর তিনজন মানুষের সহচর্য লাভ করেন। প্রথমে নিউ-এজ প্রকাশনার কর্ণধার জানকী সিংহরায়ের তরফে প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রথম বই 'কত অজানারে'- এই নামকরণটি করেন প্রেমেন্দ্র মিত্রই। রবীন্দ্রনাথের খুব পরিচিত একটি গানের লাইন থেকেই নামটি নিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

> "কত অজানারে জানাইলে তুমি
> কত ঘরে দিলে ঠাঁই
> দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
> পরকে করিলে ভাই।"[১৮]

দ্বিতীয়জন হলেন কথাসাহিত্যিক বিমল মিত্র। তিনিই শংকরের লেখার প্রথম প্রকাশক নির্বাচন করেছিলেন এবং মুখবন্ধ রচনাতে সাহায্য করেছিলেন। তৃতীয়জন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে শংকর বাবার আসনে বসিয়েছেন।

ঔপন্যাসিক শংকরের জীবনে ১৯৫৫ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যবর্তী সময়টা ছিল অগ্নিপরীক্ষার ন্যায়। বাংলার তাবড় তাবড় ঔপন্যাসিকরা তখনও সৃষ্টিশীল। তিনি লিখেছেন,

> "সারাক্ষণ নিজেকে এককোণে গুটিয়ে রাখা সত্ত্বেও, কয়েকজন জাঁদরেল কর্তাব্যক্তির বিষদৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছিলাম। এঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আমি বিলিতি ব্যারিস্টারের জুনিয়র বাবু হিসেবে পাকেচক্রে একখানা সাকসেসফুল বই লিখে ফেলেছি। কিন্তু আমাকে ওয়ান-বুক-অথর-এর পর্যায়ে ফেলে দূরে সরিয়ে রাখাটাই সঙ্গত। এঁদের দোর্দণ্ডদাপটে আমি তখন নিঃসঙ্গ, আমার বইয়ের রিভিউ হয়না, কেউ আমার কাছে লেখাও চায় না"[১৯]

একটা অসম্মানের গ্লানি তাঁর লেখক জীবনকে গ্রাস করেছে ততদিনে। 'ওয়ান বুক অথর'! যদিও একটিমাত্র বই লিখে বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নেওয়ার নজিরও বিরল নয়। এই অসময়ের মধ্যেই কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে 'বসুধারা' পত্রিকার অফিসে পরিচয় হল পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্র-স্নেহধন্য চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে। সেদিন চারুচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে অনেকটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফিরে আসেন শংকর। 'চৌরঙ্গী' লেখার আগে বিমল মিত্রের অনুরোধে 'বসুধারা'তে প্রথম লেখা ছোটগল্প পাঠালেন। মনে মনে একটা উপন্যাসের ছকও কষে ফেলেছেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 406 - 416
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বৃষ্টিতে ডুবে যাওয়া কলকাতার এসপ্ল্যানেডে জলবন্দি অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরের হোটেলবাড়ি দেখে মাথায় আচমকা একটা আইডিয়া এসে গিয়েছে। আমার কর্মজীবনের কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা ভাঙিয়ে আমিও তো হোটেলজীবনের এক কাহিনি রচনা করতে পারি!"[২০]

তারপর নিরলস পরিশ্রম। রেস্তোরা-হোটেল নিয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করলেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে তাঁকে নোট নিতেও দেখা গেল। তখনই রিডিং-রুমে বিমল মিত্রের সঙ্গে আলাপের পর্বটা সেরে ফেলেছেন। বিমল মিত্রও একই টেবিলে বসে দেশ ধারাবাহিকে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর জন্য নোট নিতেন। ১৯৬১-তে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেল 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের প্রথম কিস্তি। বেশ কয়েকটা কিস্তি লেখার পর অপমানজনক কিছু কথাও শুনতে হল। শংকর জানিয়েছেন -

> "দু'-একজন নামকরা লেখক (তাঁদের মধ্যে একজন বিদুষী লেখিকাও ছিলেন) সম্পাদককে জানালেন, নতুন ধারাবাহিকের লেখকটি হোটেলের অ আ ক খ জানে না, বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্টকে ব্রেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট লেখে! আমাকে বললে অনেক ভালো লিখতে পারতাম, আমি পাঁচ ছ'বার স্বদেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন ফাইভ স্টার হোটেলের গেস্ট হয়েছি।"[২১]

অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের শেষ কিস্তি জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে নিজের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন শংকর। ১০ই জুন, ১৯৬২ সাল তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। বই আকারে 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশের দিনই তাঁর বিয়ে। ঐ দিনেই উত্তরপাড়ার বিবাহ বাসরে বন্দনা দেবীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন শংকর।

১৯৬৩ সালে ঘটা করে তাঁকে বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে দেখা গেল। এরপর তাঁর জীবনের বড় ঘটনা প্রথমবারের জন্য বিদেশ-যাত্রা। কর্মসূত্রে তখন তিনি জনসংযোগ আধিকারিক। মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকা যান। সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের কিছুদিন তিনি সেখানে ছিলেন। দেশে ফিরে ধারাবাহিকভাবে সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখতে শুরু করেন। সেবারে নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ছাড়াও চ্যাপেল হিলে নর্থ-ক্যারোলিনা-বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে উত্তর আমেরিকায় নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখে মুগ্ধ হন তিনি। ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ তারিখের একটি লেখা থেকে জানতে পারি,

> "পৃথিবী দেখবার লোভে একদিন আচমকা নিজের দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ভূ-প্রদক্ষিণ শেষ করে বুঝেছি দূর থেকে স্বদেশ ছাড়া আর কিছুই দেখা হল না। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার নানা প্রান্তে যেখানেই বাঙালিরা আছেন সেখানেই সকলের অজান্তে ছোট্ট এক একটি সোনার বাংলা সৃষ্টি হয়েছে"[২২]

ভ্রমণ-বিষয়ক এই লেখাটি দেশ পত্রিকায় প্রথম বেরোয় ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। শংকর তখন জনসংযোগ অফিসে কর্মরত। ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ফয়সালা হয়ে গেছে। ঢাকায় পাক-সেনাদের আত্মসমর্পণ ঘটেছে। ডিসেম্বর ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। ইতিপূর্বে শংকরের লেখা ভ্রমণ-কাহিনি 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭০-এর এপ্রিল মাসে। আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হলেও এখানে যাদের কথা শংকর বলেছেন প্রায় সকলেই বাঙালি, মূলত প্রবাসী বাঙালি। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের কথাই এখানে তিনি লিখেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই আবার উপন্যাস রচনায় ফিরে গেছেন। লিখেছেন 'বোধোদয়' নামে একটি উপন্যাস। ১৯৭০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, যেদিন সাগরময় ঘোষের কাছ থেকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ পান তখন তিনি হাওড়ার বাড়িতেই ছিলেন। শংকরের বয়স তখন সাঁয়ত্রিশ বছর। পরপর কয়েকটা মৃত্যুর খবর তাঁকে আহত করে। ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ — ঐদিন বেতারে খবর শুনলেন, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় মারা গেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। কলকাতার পার্ল রোডের বাড়িতে মুজতবা আলীর সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল শংকরের। জীবিতাবস্থায় মুজতবা আলী যোগ্য সম্মান পাননি বলে মনে করেছেন শংকর। লিখেছেন-

> "আকাদেমি ও রবীন্দ্র পুরস্কারের সঙ্কীর্ণমনা মালিকগণ তাঁকে অবহেলা করে যে মহাপাপ করেছেন তার কোনো তুলনা নেই। বাংলা সাহিত্যের এই শ্লীলতাহানির জন্য ভাবীকালের কাঠগড়ায় একদিন এইসব গুণীজ্ঞানী আচার্যগণকে জবাবদিহি করতে হবে।"[২৩]

জরাসন্ধ চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর মৃত্যু ১৯৮১ সালের ২৫ মে, বিকাল ৫টার কিছুপর। তাঁর লেখা 'লৌহকপাট'-এর প্রথম পর্ব ১৯৫৩ সালের ১লা মে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কয়েকবছর আগে ব্যারিস্টার বারওয়েল সাহেবের বাবু শংকর কয়েকবার জেলখানায় প্রবেশ করেছেন। তবে চারুচন্দ্রের 'লৌহকপাট' পড়েই বন্দিজীবনের সামগ্রিক দিকটি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যেহেতু তিনি আদালতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাই এই বইটি তাঁর প্রথম বই 'কত অজানারে' লেখার ক্ষেত্রেও অনেক ভাবনায় ফেলেছিল।

> "একদিন 'লৌহকপাট'-এর প্রথম পর্ব শেষ হল— আমার মনোজগতে কত অজানারের যে অস্পষ্ট ছবি আঁকা হয়েছিল তা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। আমি বুঝলাম, আমাকে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে—আমার অনেক কথা আমি শুরু করবার আগেই বলা হয়ে গিয়েছে।"[২৪]

শেষ পর্যন্ত নিজের একটি স্বতন্ত্র পথ তিনি খুঁজে নিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য।

সাতের দশকে আরও বেশকিছু বই তিনি লিখেছেন। তারমধ্যে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, পাত্র-পাত্রী, এক-দুই-তিন, পদ্মপাতায় জল, যা বলো তাই বলো, মানচিত্র বিশেষভাবে জনপ্রিয়। 'চৌরঙ্গী' হিন্দি ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। 'কত অজানারে'-এর হিন্দি অনুবাদ 'কিনতে অনজানারে' দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক পুরস্কৃত হয়েছে।

১৯৮৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি যাযাবর অমনিবাস প্রকাশ উপলক্ষ্যে কলকাতা বইমেলাতে আনন্দবাজার কতৃপক্ষ যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেখানে সভাপতিত্ব করেন শংকর। ১৯৬৭ সালের প্রায় কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ১৯৮৬-তে শংকর আবার আমেরিকাতে যান। প্রথমে উপস্থিত হন নিউইয়র্কের ম্যানহাটান দ্বীপপুঞ্জে। সেখান থেকে ইউনাইটেড নেশনস ভবনে যান। এবারে উদ্দেশ্য প্রবাসী ভারতীয়দের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা। 'যারা নিজেদের প্রতিভায় ও সাধনায় বিদেশে মানুষের শ্রদ্ধার আসনটি সংগ্রহ করেছেন।' আমেরিকা তাঁর চোখে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তীর্থক্ষেত্র'।

প্রত্যেক কবি-সাহিত্যিকের জীবনে ফরাসি দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা আলাদা করে তাৎপর্যবহ। শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের কাছে ফ্রান্স যাওয়ার অর্থ সশরীরে স্বর্গাবলোকন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর প্যারিস ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন 'ছবির দেশে কবিতার দেশে' বইতে। শংকর প্যারিসে পৌঁছান ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ফ্রান্সে যাওয়ার পথে ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার সুযোগ ঘটে। এর মধ্যে দু'রাত তিনি লণ্ডনে কাটান। তারপর ফিরে আসেন ফ্রান্সে। দু'মাস ফ্রান্সে ঘুরে অক্টোবরের শেষে ভারতে ফিরে আসেন। পরের বছরের শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন সেসব অভিজ্ঞতার নির্যাস। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দেশ পত্রিকার পাতায় সেগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিতও হয়। ধারাবাহিক প্রকাশ শেষ হতে না হতেই ডিসেম্বর ১৯৯১-তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'মানবসাগর তীরে' নামে আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সাহিত্যের অনেক পুরস্কারই তিনি অর্জন করেছেন। প্রথমে 'কত অজানারে'র জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিংহ দাস পুরস্কার পান। এছাড়া পেয়েছেন শরৎ পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার ও আনন্দ পুরস্কার। পেয়েছেন জগত্তারিণী গোল্ড-মেডেল। উপন্যাস 'চৌরঙ্গী' শ্রেষ্ঠ বাইন্ডিং-এর জন্য পুরস্কৃত হয়। উত্তরবঙ্গ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছে ডি. লিট. সম্মান। ২০১৯ সালে একবছরের জন্য কলকাতার শেরিফ পদেও মনোনীত হন। সম্প্রতি 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' তাঁকে সম্মানিত করেছে। স্মৃতিকথা 'একা একা একাশি'র জন্য ২০২০-তে পেয়েছেন 'সাহিত্য অকাদেমি' সম্মান।

গ্রন্থ তালিকা : শংকর

বিশেষ রচনা (রম্যরচনা/স্মৃতিকথা) :

'যা বলো তাই বলো' (১৯৫৯), 'এক দুই তিন' (১৯৬১), 'যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ' (১৯৬৩), 'মানচিত্র' (১৯৬৫), 'এক যে ছিল' (১৯৭৫), 'এই তো সেদিন' (১৯৮৫), 'অনেক দূর' (১৯৯০), 'চরণ ছুঁয়ে যাই' (১৯৯৪-২০০২-২০০৭), 'যেতে যেতে যেতে' (১৯৯৪), 'বঙ্গ বসুন্ধরা' (১৯৯৯), 'ছায়াছবি' (১৯৯৯), 'রসবতী' (২০০০), 'গল্প হলেও সত্যি' (২০০২), 'মনে পড়ে' (২০০৩), 'বাঙালির বিত্তসাধনা সাহারার ইতিকথা' (২০০৩), 'বাঙালির খাওয়া দাওয়া' (২০০৫), 'অনেকদিন আগে' (২০০৫), 'তিন ভুবনের কথা' (২০০৬), 'খবর এখন' (২০০৭), 'আমাদের দিনচর্চা' (২০১০), 'একা একা একাশি' (২০১৫), 'দুঃসময়ের দিনলিপি', (২০২০), 'সত্যজিৎ শতাব্দী সমকালের স্মৃতি', 'বিস্মৃতি ও কিছু বিভ্রান্তি' (২০২১)।

ভ্রমণ সাহিত্য :

‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’ (১৯৭০), ‘যেখানে যেমন’ (১৯৭৪), ‘জানা দেশ অজানা কথা’ (১৯৮৮), ‘মানবসাগর তীরে’ (১৯৯১), ‘এখানে ওখানে’ (১৯৯১)। ২০১২ সালে ‘সাহিত্যম্’ থেকে দু’খণ্ডে শংকরের ‘ভ্রমণ সমগ্র’ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ভ্রমণ সম্পর্কিত কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতির লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি হল – ‘বাল্মীকি কেন মহাভারত লিখতে রাজি হলেন না?’, ‘ঘরছাড়া দিকহারা’, ‘ডিভাইন এন্টারপ্রাইজের উৎস সন্ধানে’, ‘আজব দেশের আজব নাপিত’।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক গ্রন্থ :

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত’ (১৯৯৮), ‘অচেনা অজানা বিবেকানন্দ’ (২০০৩), ‘আমি বিবেকানন্দ বলছি’ (২০০৮), ‘নির্বাচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ (২০০৯), ‘অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ’ (২০১০), ‘আশ্চর্য বিবেকানন্দ’ (২০১৪), ‘একাদশ অশ্বারোহী’ (২০১৬), ‘আহারে অনাহারে বিবেকানন্দ’ (২০১৭), ‘সপ্তজননীর অমৃতকথা’ (২০২০)

উপন্যাস :

‘কত অজানারে’ (১৯৫৫), ‘পদ্মপাতায় জল’ (১৯৬০), ‘চৌরঙ্গী’ (১৯৬২), ‘নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি’ (১৯৬৫), ‘রূপতাপস’ (১৯৬৭), ‘বোধোদয়’ (১৯৬৯) ‘সীমাবদ্ধ’ (১৯৭১), ‘স্থানীয় সংবাদ’ (১৯৭১), ‘আশা আকাঙ্ক্ষা’ (১৯৭৩), ‘জন-অরণ্য’ (১৯৭৩), ‘সম্রাট ও সুন্দরী’ (১৯৭৫), ‘মরুভূমি’ (১৯৭৮), ‘সুবর্ণ সুযোগ’ (১৯৭৯), ‘সোনার সংসার’ (১৯৮০), ‘মানসম্মান’ (১৯৮১), ‘নবীনা’ (১৯৮২), ‘একদিন হঠাৎ’ (১৯৮২), ‘বিত্তবাসনা’ (১৯৮৩), ‘তীরন্দাজ’ (১৯৮৪), ‘মনজঙ্গল’ (১৯৮৫), ‘মাথার ওপর ছাদ’ (১৯৮৬), ‘মুক্তির স্বাদ’ (১৯৮৭), ‘কাজ’ (১৯৮৮), ‘এবিসিডি লিমিটেড’ (১৯৮৯), ‘ঘরের মধ্যে ঘর’ (১৯৯০), ‘দিবস ও যামিনী’ (১৯৯২), ‘সুখ সাগর’ (১৯৯২), ‘বাংলার মেয়ে’ (১৯৯৩), ‘নগর নন্দিনী’ (১৯৯৪), ‘সীমন্ত সংবাদ’ (১৯৯৪), ‘পটভূমি’ (১৯৯৫), ‘কামনা-বাসনা’ (১৯৯৬), ‘সহসা’ (১৯৯৮)।

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বেশকিছু উপন্যাস পরে ‘যুগল উপন্যাস’ ও ‘ত্রয়ী উপন্যাস’ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। ‘যুগল উপন্যাস’ হল ‘তনয়া’ (সীমন্ত সংবাদ ও নগরনন্দিনী), ১৯৭৮/ ‘তীরন্দাজ’ (তীরন্দাজ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট), ১৯৮৪/ ‘মনজঙ্গল’ (মনোভূমি ও মনজঙ্গল), ১৯৮৫/ ‘ত্রয়ী উপন্যাস’ হল ‘স্বর্গ-মর্ত-পাতাল’ (জনঅরণ্য, সীমাবদ্ধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা), ১৯৭৬/ ‘জন্মভূমি’ (স্থানীয় সংবাদ, সুবর্ণ সুযোগ, বোধোদয়), ১৯৮৩/ ‘কাল-বিকেল-সন্ধ্যে’ (বিত্তবাসনা, সোনার সংসার, সম্রাট ও সুন্দরী), ‘কথাসাগর’ (কাজ, এবিসিডি লিমিটেড, মান সম্মান) ।

শিশুসাহিত্য/ কথাসাহিত্য :

‘পাত্র-পাত্রী’ (১৯৬৪), ‘সার্থক জনম’ (১৯৬৮), ‘এক ব্যাগ শংকর’ (১৯৭৭), ‘চিরকালের উপকথা’ (১৯৮১), ‘সপ্তরথী’ (১৯৯৩), ‘কিশোর রচনা সমগ্র’ (২০০২), ‘পুরোহিত দর্পণ’ (২০০৩)।

Reference:

১. শংকর, ‘একা একা একাশি’, দে’জ, কলকাতা ৭৩, পরিবর্ধিত সপ্তম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ১৩
২. শংকর, ‘চরণ ছুঁয়ে যাই-২’, দে’জ, কলকাতা ৭৩, সপ্তদশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৯
৩. তদেব, পৃ. ৯
৪. তদেব, পৃ. ১২
৫. শংকর, ‘একা একা একাশি’, দে’জ, কলকাতা ৭৩, পরিবর্ধিত সপ্তম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২১ পৃ. ৩৪
৬. শংকর, ‘চরণ ছুঁয়ে যাই-২’, দে’জ, কলকাতা ৭৩, সপ্তদশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৩৫
৭. শংকর, ‘চরণ ছুঁয়ে যাই-১’, দে’জ, কলকাতা ৭৩, পঞ্চচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৪
৮. তদেব, পৃ. ৪২
৯. শংকর, ‘চরণ ছুঁয়ে যাই-২’, দে’জ, কলকাতা ৭৩, সপ্তদশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১১৮

১০. তদেব, পৃ. ১৩৬
১১. তদেব, পৃ. ৬৩
১২. শংকর, ‘একা একা একাশি’, দে’জ, কলকাতা ৭৩, পরিবর্ধিত সপ্তম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ১৬৫
১৩. তদেব
১৪. তদেব, পৃ. ৩৭৪
১৫. শংকর, ‘চরণ ছুঁয়ে যাই-১’, দে’জ, কলকাতা ৭৩, পঞ্চচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৬০
১৬. তদেব, পৃ. ৬৫
১৭. তদেব, পৃ. ৬৬
১৮. তদেব, পৃ. ১৩৮
১৯. শংকর, ‘একা একা একাশি’, দে’জ, কলকাতা ৭৩, পরিবর্ধিত সপ্তম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ২৭৮
২০. তদেব, পৃ. ২৭৮
২১. তদেব পৃ. ২৮০
২২. শংকর, ‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’, দে’জ, কলকাতা ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০২১, পৃ. ১১
২৩. শংকর, ‘চরণ ছুঁয়ে যাই-১’, দে’জ, কলকাতা ৭৩, পঞ্চচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ২১৩
২৪. তদেব, পৃ. ২১৫

Bibliography:

একা একা একাশি, শংকর, দে’জ, কলকাতা ৭৩, পুস্তকমেলা ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
এপার বাংলা ওপার বাংলা, শংকর, দে’জ, কলকাতা ৭৩, ১৯৭০
চরণ ছুঁয়ে যাই-১, শংকর, দে’জ, কলকাতা ৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৪
চরণ ছুঁয়ে যাই-২, শংকর, দে’জ, আসানসোল বইমেলা, জানুয়ারি ২০০২
চরণ ছুঁয়ে যাই-৩, শংকর, দে’জ, কলকাতা ৭৩, জানুয়ারি ২০০৭
মানবসাগর তীরে, শংকর, দে’জ, কলকাতা ৭৩, ১৯৯১